*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 365 - 373
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

# দীপক চন্দ্রের ‘কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন’ উপন্যাসে মহাভারতের প্রতিহিংসা ও রাজনীতির পুনর্নির্মাণ : একটি পর্যালোচনা

দীপা মাজি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : dipamaji7@gmail.com

***Received Date*** *20. 12. 2024*
***Selection Date*** *01. 02. 2025*

**Keyword**
*Humiliation, Neglect, Violence, Anger, Vengeance, Rivalry, Diplomacy, Family Politics, Revenge*

**Abstract**
*Krishna Dvaipayana (Vyasadeva) is the author of the Mahabharata and an important character in the Mahabharata. He is not a king, nor is he a Kshatriya. He is the son of Parashara Muni and Satyavati. He was a learned scholar. Deepak Chandra's novel ‘Kurukshetra Dvaipayana’ shows him as a politician and a person who is obsessed with revenge. Revenge paved the way for politics in the Mahabharata. This revenge was born in the mind of Vyasadeva, the creator of the Mahabharata. How the desire for revenge led to the great war of Kurukshetra. That has been newly embodied in Deepak Chandra's novel Kurukshetra Dvaipayana. The neglect of the lower castes by the upper castes pained Vyasadeva's mind. He could not accept the disrespect and neglect done by his father to his mother. Similarly, he could never forget the humiliation and humiliation done by Ambika, the wife of Vichitravirya. He took revenge on Ambika's son Dhritarashtra. Vyasadeva's revenge ended with the death of Duryodhana. In the Mahabharata, Vyasadeva represented the non-Aryans and the lower castes. The war in the Mahabharata was actually the result of his revenge on the Aryans. For this, he followed the path of diplomacy. That is why he is seen favoring the Pandavas in the Mahabharata. Along with this, the rivalry between Bhishma and Dwaipayana is highlighted. Neither of them is a king. However, both of them were present in politics. One outside, the other inside. Their fight was going on behind everyone's eyes. They were jealous of each other. They made many different plans to maintain their honor and existence in the family. Their rivalry, anger, jealousy, and cunning political activities are described in this novel. The novelist has presented a different side of the politics of the Mahabharata to the reader through his own perspective.*

## Discussion

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনায় পরিবর্তন ঘটে, তার প্রভাব পড়ে সমাজে, সংস্কৃতিতে এবং সাহিত্যে। পরিবর্তনশীল সমাজে সময়ের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রচলিত পুরাণ কাহিনিগুলির বিনির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ ঘটে চলেছে। পুরাণ

বা মহাকাব্যকে কখনও চরিত্রগত দিক থেকে, আবার কখনও বা ঘটনার দিক থেকে মূল কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বারবার পুনর্গঠন করা হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যিকেরা মূল কাহিনিকে অপরিবর্তিত রেখে সমকালের ভাবনা, নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা মহাকাব্যকে নতুনরূপে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা মহাকাব্যের পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ভাবনার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবনা মেলবন্ধন এবং আধুনিক রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ভারতীয় সাহিত্যের দুই যুগান্তকারী মহাকাব্য – 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। মহাভারত প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান ভাণ্ডার, তার সঙ্গে এই মহাকাব্য লোকশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। এই মহাকাব্যে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। তেমনই প্রকাশ পেয়েছে মানবমনের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। মহাভারত ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে যতটা প্রাসঙ্গিক, ততটাই রাজনৈতিক গ্রন্থ হিসাবে। প্রাচীন ভারতের রাজনীতির আকর গ্রন্থ বললেও ভুল হবে না। সেই সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বার্থে বিবাহ দেওয়ার প্রচলন ছিল, এই মহাকাব্যে তার অনেকগুলি উদাহারণ পাওয়া যায়। মহাভারতের রাজনীতি প্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি তাঁর 'মহাভারত নীতি অনীতি ও দুর্নীতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

> "মহাভারতের মধ্যে বহু জায়গাতেই রাজনীতির উপদেশ আছে, যেটাকে আমরা শাস্ত্রীয় রাজনীতি বা অর্থশাস্ত্র বলতে রাজি আছি, কিন্তু মহাভারতে জীবনটা যেভাবে চলছে, সেখানে শতসহস্র সামাজিক তথা পারিবারিক টানাপোড়ন চলে, কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকারে আছেন বলেই সেইসব পরিবার এবং তাঁদের সামাজিক পরিবেশটাও রাজনৈতিক হয়ে ওঠে, অথচ রাজনীতির চরিত্র মহাভারতের শাস্ত্রীয় রাজনীতির থেকে এক্কেবারেই আলাদা।"[১]

নীতি-দুর্নীতি, দ্বেষ-বিদ্বেষ, ক্ষোভ, বিদ্রোহ, হিংসা-প্রতিহিংসা এই সকল বৈশিষ্ট্যই সেই রাজনীতিতে বিদ্যমান। আমি এই প্রবন্ধে মহাভারতের প্রতিহিংসার কথায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। 'প্রতিহিংসা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অনিষ্টকারীর ক্ষতিসাধনের প্রবৃত্তি' বা 'প্রতিশোধ'। অনেকেই এই মহাকাব্যকে হিংসার রাজনীতি বলেছেন। মহাভারতে শুধু হিংসার কথা উল্লেখ থাকলে কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। হিংসার পরে রয়েছে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা। এই প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে এক থেকে একাধিক ব্যক্তির হৃদয়ে। গ্রাস করেছে সুপুরুষ, দেবতা, মুনি, ঋষির জীবনকেও। মহাভারত যে প্রতিহিংসার কথা নিহিত আছে তা আর্য-অনার্যের ও উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের। এই সম্পর্কে প্রতিভা বসু 'মহাভারতের মহারণ্যে' প্রবন্ধের 'প্রাক্ কথন' অংশে লিখেছেন –

> "...মহাভারতের বিশাল প্রেক্ষাপটে বিধৃত এক অনস্বীকার্য কালো-সাদার দ্বন্দ্ব। সংঘাত বৈধ-অবৈধের, আর্য-অনার্যের। লক্ষণীয়, যে ভারতবর্ষে আজও জাতিভেদ প্রবল, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ গাত্রবর্ণে প্রতিফলিত, সেখানে ক্ষত্রিয়-কুলের এই কাহিনীতে কৃষ্ণবর্ণের আধিপত্য সর্বত্র, অবৈধ অনার্য এবং মিশ্ররক্তের জয়জয়কার, শুদ্ধ শোণিতের চূড়ান্ত পতন ও বিলুপ্তি।"[২]

'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন' উপন্যাসের রচয়িতা দীপক চন্দ্র। ঔপন্যাসিকের জন্ম ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ (ইং ১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৮)। তিনি পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাস রচনার প্রতি ঝোঁক না রেখে পৌরাণিক ঔপন্যাসিক হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমাজ সচেতনতা, বাস্তবিক চিন্তা, সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের মূল্যবোধ। তিনি তাঁর সব রচনায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মিল রেখে কাহিনির পুনর্নির্মাণ করেছেন। তাঁর বই- এর সংখ্যা প্রায় ৭০। সম্পাদিত গ্রন্থ ৫টি। তারমধ্যে মহাভারত আশ্রয়ী উপন্যাসগুলি হল – ১. 'দ্রৌপদী চিরন্তনী', ২. 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন', ৩. 'এবং অশ্বত্থামা', ৪. 'মহাভারতে শকুনি', ৫. 'দ্বৈপায়নে দুর্যোধন', ৬. 'পিতামহ ভীষ্ম' ৭. 'তোমারী নাম কর্ণ', ৮. 'সাম্রাজ্ঞী কুন্তী', ৯. 'গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রে গান্ধারী, ১০. 'দ্রৌপদী চিরন্তনী' ইত্যাদি। আলোচ্য উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসে ব্যাস চরিত্রের ভিন্নতর রূপ আমরা দেখতে পাই। এখানে তিনি অলৌকিকতাকে বর্জন করেছেন এবং মানুষের বিচলিত হৃদয়ের একেবারে অন্তঃস্থলের গতিপ্রকৃতির সন্ধান করেছেন। মহাভারতের ব্যাস চরিত্র অবলম্বনে ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শাহজাদ ফিরদাউস রচিত উপন্যাসের নাম 'ব্যাস'। এখানে মনুষ্যত্বের অন্বেষণ করা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়েছে। এছাড়া নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীর ‘মহাভারতে ছয় প্রবীণ’, সুখময় ভট্টাচার্যের ‘মহাভারতের চরিতাবলী’ ইত্যাদি প্রবন্ধে ব্যাস চরিত্র সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেব, তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামেও সুপরিচিত। তিনি যেমন এই মহাকাব্যের স্রষ্টা, তেমন এই মহাকাব্যের গুরুত্বপুর্ণ এক চরিত্র। উপচিরবসু ও অদ্রিকার কন্যা সত্যবতী। কিন্তু সত্যবতী দাসরাজ নামে এক ধীবরের গৃহে পালিত হন। তাঁর রূপে মোহিত হন ঋষি পরাশর। পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম হয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের। যমুনার দ্বীপে জন্মগ্রহন করেছিলেন বলে ব্যাসদেবের আরেক নাম দ্বৈপায়ন। অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে তিনি মহাভারতে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করছেন। মহাভারতের আদিপর্বে তাঁর শিষ্য বৈশাম্পায়ণ ব্যাসের জন্মের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধু মহাভারত রচনা করে গেছেন তা নয়, তিনি নিজে বেদের ভাগ করেছিলেন। প্রথমে বেদের চারটি ভাগ ছিল না। ভাগ ছিল একটাই। পরে বেদকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজানো হয়।

রাজশেখর বসু ‘কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ’ গ্রন্থে ভূমিকায় ব্যাসদেব প্রসঙ্গে বলেছেন –

> “ইনি মহাজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ, কিন্তু সুপুরুষ মোটেই নন।”[৩]

ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্রও এই চরিত্রটিকে সুপুরুষ বলে চিহ্নিত না করলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপিত করে বলেছেন –

> “ব্যাসদেব ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, ঐতিহাসিকও বটে। ইতিহাস রচনায় তিনি নিরপেক্ষ নন, পাণ্ডবের পক্ষে।”[৪]

ব্যাসদেব কুরুবংশের রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তিনি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়ও নন। সত্যবতীর কুমারী বয়সের সন্তান। অথচ কুরুবংশের রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন - এঁদের সকলের রাজ্যাভিষেকে তাঁর পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ লক্ষ করি। কুরুবংশের বিভিন্ন সময় সংকটের কালে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এবং সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি পাণ্ডবদের পক্ষ কেন নিয়েছিলেন তার কারণও অতিসংক্ষিপ্তভবে বলেছেন –

> “নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় ব্যথা তাঁর লুকানো ছিল। আলোচ্য উপন্যাসে আমি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের জীবনে সেই অনুদ্ঘাটিত দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ও বঞ্চনাকে আবিষ্কার করেছি।”[৫]

এই উপন্যাসে তিনি পুরাণের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কাহিনির পুনর্গঠন করেছেন। অপমান, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা রাজনীতির পথকে সুপ্রশস্ত এবং সুদৃঢ় করে তুলেছে। এখানে দ্বৈপায়নের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ভীষ্ম। দ্বৈপায়নের কুরুবংশের সমগ্রকুলের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ ছিল, সেই বংশের জন্মদাতা তিনিই। তা সত্ত্বেও তিনি রাজকর্ম থেকে ব্রাত্য। ভীষ্ম যেভাবে রাজকর্মে লিপ্ত থাকতেন সেটা তিনি পারতেন না বলে ক্ষোভ ও হিংসা দুই-ই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। তেমনই ভীষ্মও ব্যাসদেবের হস্তিনাপুরে অবাধ আনাগোনাকে অপছন্দ করতেন। ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের বিরোধ, বিদ্বেষও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত এগিয়েছিল। দীপক চন্দ্র এই উপন্যাসের দৃষ্টিকোণে উল্লেখ করেছেন –

> “...কেবল দ্বন্দ্বের পরিবেশটা ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। গোটা মহাভারত কাহিনি এই দুই ভাই-এর বিরোধ ও বিদ্বেষের ফল। শ্রীকৃষ্ণ রাজনৈতিক ঘটনার রাশ ধরেছিল আর ব্যাসদেব তার ভেতরটা জীর্ণ করার ইন্ধন জুগিয়েছিল।”[৬]

ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং বিরোধ এই যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে জ্ঞাতিদ্বন্দ্বের কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেই দ্বন্দ্বের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা। তাঁরা কেও-ই রাজা নন। দ্বৈপায়নের ব্যক্তিগত হিংসা, ক্ষোভ, অপমান অবহেলা মহাভারতে

রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেই কথা স্পষ্টভাবে সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে দীপকচন্দ্রের এই উপন্যাসে।

ব্যাসদেব ছিলেন ঋষি। তাই তাঁর একটা অনুতাপ ছিল, যে তিনি লৌকিক হৃদয়চর্চা করতে পারবেন না। তিনি সাংসারিক জীবন ও আত্মীয় পরিজনদের প্রতি কোনোরকম আন্তরিকতাও অনুভব করতেন না। তবুও তাঁর হৃদয়কে এক অস্থিরতা গ্রাস করেছিল –

> “ভিতরে ভিতরে এ কোন অস্থিরতা সে টের পাচ্ছিল? এ অনুভূতি কীসের? ব্যথা নয়। বেদনা নয়, জ্বালা নয় একটা কীসের ভার যেন হৃদপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে রইল।”[৭]

তখন তাঁর মনে বাল্যস্মৃতির কথা জাগ্রত হয়। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত তিনি। শৈশবে তিনি জননীর সান্নিধ্য পেলেও তাঁর মন অতৃপ্ত থেকে গেছে। তিনি সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে শুধু জননীকেই চেয়েছেন। তাঁর পিতার কথা স্মরণ করলে মনে জেগে উঠেছে বিষন্নতা। পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ ছিল না। ব্যাসদেব জানতেন মনু মহারাজের কথা। মনু মহারাজ বলেছিলেন যে, যে ব্রাহ্মণ একবার শূদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবে তার প্রায়শ্চিত্ত করেও কোন লাভ হবে না। ব্যাসদেবের জন্মকালে সেই প্রায়শ্চিত্তের ভয়ানক অপরাধ ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর পিতা পরাশর মহামনি বলে স্বয়ং আপন তেজে দীপ্যমান ছিলেন। পিতার সেই বিপুল প্রতাপকে তিনি মনে মনে ঘৃণা করতেন। যখন তাঁর ১২ বছর বয়স, তখন তাঁকে মানুষ করার জন্য পরাশর মুনি সত্যবতীর কাছ থেকে জোরপূর্বক বদরিকা আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত বারো বছর বয়সে। তখন থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুপ্ত বেদনা মনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের আগে এই প্রতিহিংসা দেখা দিয়েছিল দাসরাজের মধ্যে। তিনি ছিলেন অনার্য। আর্যরা অনার্যদের কাছে চিরকাল অবহেলিত। তাই পুরুবংশের রাজা শান্তনু যখন দাসরাজের কাছে সত্যবতীকে বিবাহের অনুমতি চায়, তখন দাসরাজের মনের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল –

> “যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞার নেশায় আর্যরা অনার্যদের চিরকাল অবহেলা করে, তাদের সুখ-দুঃখ মনোবেদনার দিকে তাকায় না, সেই ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি হবে না – কে বলবে?”[৮]

দাসরাজ তাঁর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ দিতে রাজি হয়েছিলেন একটি শর্তে যে শুধুমাত্র সত্যবতী সন্তানেরাই কুরুবংশের উত্তরাধিকারী হবে ও সাম্রাজ্য লাভ করবে। শান্তনু তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র দেবব্রত (ভীষ্ম)-এর সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করেন। দেবব্রত দাসরাজের শর্ত মেনে নিয়ে তাঁর সম্মুখে যুবরাজের উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন। তখন অনার্য দাসরাজের মনে এক প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে –

> “দাসরাজের মুখে হাসি চোখে কপটতা। তাঁর শরীরের মধ্যে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট এক প্রতিশোধস্পৃহা বার বার শিহরিত হয়ে গেল।”[৯]

তাই তিনি কপটতার ছলে দেবব্রতকে আজীবন অবিবাহিত থাকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন। শান্তনু ও সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্য। তাঁর মৃত্যুর পর কুরুবংশকূল রক্ষার্থে সত্যবতী তাঁর কানীন পুত্র ব্যসদেবকে ডেকে পাঠান। তিনি সত্যবতীর অনুরোধে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে শারীরিক ভাবে মিলিত হতে রাজি হন। মিলনের সময় অম্বিকা তাঁকে চরম অপমান করেন। তখন ব্যাসের মনে এক অদম্য প্রতিহিংসার জন্ম নেয় -

> “আর্য-অনার্য ঘৃণার কূট সন্দেহ যখন সত্যি হয়ে উঠল, দ্বৈপায়নের অন্ত্রে সত্যিকারের বিজাতীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও প্রবল প্রতিহিংসা পুঞ্জিভূত হল।”[১০]

ক্রোধ, বিদ্বেষ তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। তিনপুরুষ ধরে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের অপমান, অবহেলা করে এসেছে। এই শ্বেতাঙ্গদের কাছে অপমানের শিকার হয়েছেন তাঁর মাতামহী অদ্রিকা, মাতা সত্যবতী এবং তিনি নিজেই – এইসব কথায় তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল –

> "তিন পুরুষ ধরে একটি বংশধারা শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা, অবহেলা, অনাদর, লাঞ্ছনা, অপমানের শিকার হচ্ছে কেন? তবে কি, মানুষের অমঙ্গল কামনা অভিশাপের রূপ ধরে তাকে দিয়ে সেই শোধটায় তুলতে চায়?"[১১]

দ্বৈপায়নের ঔরসে অম্বিকা, অম্বালিকা ও দাসীপুত্রের গর্ভে তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় – ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুর। তবে দ্বৈপায়নের বিদুরের প্রতি সর্বাধিক স্নেহ ছিল। সেটা ভীষ্ম অনুমান করতে পেরেছিলেন। গঙ্গা ও শান্তনুপুত্র ভীষ্মের রাজনীতি জ্ঞান ছিল প্রখর। তাই তিনি সকলের কাছে সম্মানীয়। তিনি প্রজাপালক, রণনীতিতেও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। রাজপুত্রদের মধ্যে কে সিংহাসনে বসবে এই বিষয়ে ভীষ্ম দ্বৈপায়নের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তিনি নৃপতি হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রকে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কারণ ধৃতরাষ্ট্র শান্ত, স্থির প্রকৃতির, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাঁর কূট রাজনীতি জ্ঞানও তীক্ষ্ণ। শুধু তিনি জন্মান্ধ ছিলেন এটাই তাঁর ব্যর্থতা বলে মনে করেছিলেন ভীষ্ম। তাঁর কাছে ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি হিসাবে যোগ্য। কিন্তু দ্বৈপায়নের তা মনে হয়নি। তাঁর মনে হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্র দাম্ভিক, অহংকারী ও ঈর্ষাপরায়ণ। তাঁর মধ্যে আর্যত্বের অহংকার ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের স্বভাব তাঁর মা অম্বিকার মতই হয়েছে। দ্বৈপায়ন হস্তিনাপুরের সিংহাসনের জন্য কার নাম উল্লেখ না করে নৃপতি নির্বাচনের কতগুলি সাধারণ নিয়মের কথা বলেন -

> "রাজনীতিতে নৃপতি নির্বাচনের পথ সবরকম এক হয় না। নৃপতির অভিষেকের সময় অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে। রাজনীতির রহস্যময় খেলায় রাজার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা একটা মস্ত সম্বল। সুতরাং, নৃপতি নির্বাচনের সময় মানুষের চিত্ত প্লাবিত করার আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বও পরিমাপ করে দেখতে হয়।"[১২]

তিনি ব্রহ্মচারী হলেও তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানও তীব্র - তার যথেষ্ট পরিমাণ পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। এখানে তিনি নিজেকে নির্বিরোধী, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন বলেই কূট রাজনীতির পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি ছদ্মবেশে ধারণ করেছিলেন সন্ন্যাসীর সাজ এবং ঘৃণার মুখোশ। দ্বৈপায়নের সমর্থনেই যে পান্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছিলেন, সেটা ভীষ্ম বুঝতে পেরেছিলেন। মহাভারতে সেভাবে প্রকাশ না পেলেও এই উপন্যাসে একে অপরের প্রতি রেষারেষি খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ভীষ্মও যে চুপ করে বসেছিলেন তা নয়। তিনিও রাজসভায় নিজের স্থানটিকে বজায় রাখার জন্য পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যান। ধৃতরাষ্ট্রের রাজা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, শারীরিক আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়নি দেখে ভীষ্ম তাঁর বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। সেইসময় গান্ধার যুবরাজ শকুনি হস্তিনাপুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও রাজনৈতিক সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে আসেন। শকুনির কূট রাজনীতিতে তিনি মুগ্ধ হন। তিনি গান্ধার রাজ্যের সংকটের সুযোগ নেন। তিনি শকুনিকে রাজনৈতিক সাহায্যের জন্য পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করার প্রস্তাব জানান। শকুনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হন। ঔপন্যাসিক শকুনির এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন –

> "রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে ভীষ্ম তাকে এক অদ্ভুত রাজনীতির প্যাঁচে ফেলল। এখন গান্ধার রাজ্যের গৌরব, মর্যাদা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে প্রিয় ভগিনী গান্ধারীকে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠলগ্ন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ তার সামনে ছিল না।"[১৩]

ভীষ্ম গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের গোপনে বিয়ে দিয়ে দ্বৈপায়নের ভেতর অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে তুললেন। তিনি এখানেই গৃহবিবাদের রাজনীতির সূত্রপাত করলেন। এই বিবাহের মধ্য দিয়ে ভীষ্ম সমাজের সামনে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন - যা মানুষের কাছে স্মরণীয় এবং বিস্ময়ের।

১. সুদূর গান্ধার থেকে রাজকন্যা হস্তিনাপুরে স্বয়ং এসেছিলেন অন্ধ রাজপুত্রকে (যিনি রাজাও নন) বিয়ের উদ্দেশ্যে।
২. পতিব্রতা নারীর আদর্শের কথা।
৩. ধৃতরাষ্ট্রের সৌভাগ্য, যিনি পেয়েছিলেন একজন কূটনীতিবিদ শ্যালক। যে তাঁর পক্ষে সবসময় থাকবে।

ভীষ্মের পারিবারিক রাজনীতিতে সূক্ষ্ম পদক্ষেপ গুলোকে খুবই বিশদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই উপন্যাসে। ভীষ্মের ঘরে ও বাইরের রাজনীতিতে অবাধ কর্তৃত্বকে মেনে নিতে পারেননি দ্বৈপায়ন। তাঁর ভাবনায় ভীষ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনিই –

> "পাণ্ডুকে সামনে রেখে ভীষ্ম তার দিকেই তির তাক করেছে। ভীষ্ম নেপথ্যে থেকে তার কাজ করার জন্যে ধুরন্ধর শকুনিকে রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়েছে। মুখে না বললেও ভীষ্মের মূল লড়াইটা কার্যত তাঁর সঙ্গে। পাণ্ডু উপলক্ষ্য। লক্ষ্য সে।"[১৪]

এভাবে সবার আড়ালে ভীষ্মের সঙ্গে দ্বৈপায়নের গোপনে সংঘাত চলতে থাকে। সেই সংঘাতে বিপর্যস্ত হয় পাণ্ডুর জীবন। তাকে সিংহাসন ত্যাগ করে নির্বাসনে যেতে হয়। ভীষ্ম শুধু একা রাজনৈতিক খেলা খেলেনি, দ্বৈপায়নও এই খেলায় অংশগ্রহন করেছিলেন। সেই খেলার তিনিই সংগঠক আর পরিচালক। তাঁর মনের মধ্যে সুপ্ত প্রতিহিংসা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই হস্তিনাপুরের ভেতর ও বাইরে এই কূট রাজনীতির খেলা শুরু করতে তিনি অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি বিদুরকে কুরুবংশের বিরূদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং তাঁকে সিংহাসনের প্রলোভন দেখিয়েছেন। তিনি বিদুরের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলেছেন এবং সতর্ক করে জানিয়েছেন –

> "তোমার ধমনিতে বিশুদ্ধ অনার্য রক্ত, তুমি কৃষ্ণবর্ণ – চির অনাদৃত। অনার্যদের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ বন্ধের রাজনৈতিক টোপ হলে তুমি। তোমার জনরঞ্জনী শক্তিকে ওরা প্রজারোষের বর্মরূপে ব্যবহার করবে।"[১৫]

ধৃতরাষ্ট্র অম্বিকার গর্ভজ সন্তান। অম্বিকার অপমান দ্বৈপায়নকে সবথেকে বেশি কষ্ট দিয়েছিল। দ্বৈপায়ন ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করতে না পারলেও তাঁর মনে দুশ্চিন্তা, ভয়কে তীব্র করে তুলেছিলেন তিনি। কুন্তীর পুত্রলাভের সংবাদ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মনের ভেতর এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডুপুত্ররা ও পাণ্ডু স্ত্রী কুন্তী আশ্রয়ের জন্য হস্তিনাপুরে আসতে চায়। পাণ্ডুপুত্ররা সকলেই ছিল দেবতাদের সন্তান। হস্তিনাপুরে তাঁদের আগমন নিয়ে রাজ অভ্যন্তরে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। ধৃতরাষ্ট্র এবিষয়ে ভীষ্মের কাছে পরামর্শ চান। ভীষ্ম একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। ভারতীয় মহাকাব্যে তাঁর রাজনীতিবিদ আমরা খুব কমই দেখতে পাই। দীপক চন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন' উপন্যাসে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভীষ্ম চরিত্রের কথা ও কার্যকলাপের মধ্যে এক দক্ষ রাজনীতিবিদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে –

> "রাজনীতিতে কৌশলটাই মুখ্য। জয়ের জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হয়।"[১৬]

পাণ্ডবেরা রাজপরিবারে এলে পাণ্ডব এবং ধার্তরাষ্টের সঙ্গে বিরোধের সূচনা হয়। পাণ্ডব এবং ধার্তরাষ্ট্রদের চরিত্রের মধ্যে স্বভাব ও প্রকৃতিগত অমিল ছিল। হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই মূলত তাঁদের লড়াই। মহাভারতে শকুনি বা কৃষ্ণ ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদের মধ্যে লড়াই-এ ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। কিন্তু নেপথ্যে কূট রাজনীতি পরিচালনা করে গেছেন ব্যাসদেব, সেকথা মহাভারতে অপ্রকাশিত। সেটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে।

দুর্যোধন ও শকুনির পরিকল্পনায় বারনাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেটি ব্যর্থ হয়ে যায়। পাণ্ডবরা যে জীবিত সেকথা ব্যাসদেব জানতেন। মহাভারতের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীর 'মহাভারতের ছয় প্রবীণ' প্রবন্ধে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য –

> "ব্যাস বুঝিয়ে ছিলেন - তিনি কেবলমাত্র পিতামহের নিম্নগামী নিয়ে স্নেহধারায় সিক্ত হয়ে এখানে আসেননি, পান্ডবদের যেভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে, যেভাবে অন্যায় অধর্মের পথে কুট কৌশলে তাদের নিগৃহীত করা হয়েছে, তাতে তিনি খুশি হননি। খুব বাস্তব কারণেই তা আর স্নেহ-পক্ষপাত বর্ষিত হয়েছে

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

> পাণ্ডবদের ওপর এবং এতে আশ্চর্য কিছু নেই, কেননা আত্মীয় পরিজনেরা এভাবেই বঞ্চিত ব্যক্তির পক্ষপাতি হয়ে পড়েন।"[১৭]

কিন্তু ঔপন্যাসিক উপন্যাসের এখানে ব্যাস-এর কূটনীতিতে স্পষ্ট করার জন্য পাঠকের মনের মধ্যে সংশয় এনে দিয়েছেন। তার জন্য ব্যবহার করেছেন কতগুলি জিজ্ঞাসা(?) চিহ্ন –

> "ভস্মস্তূপের ভেতর থেকে পাঁচটি পুরুষের ও একটি রমণীর দেহ পাওয়া গেছে। তবুও ব্যাসদেব কেমন করে জানল তারা জীবিত আছে? কি করে তাদের গোপন অবস্থান টের পেল? গহন অরণ্যে আদিবাসীর ছদ্মবেশে বাস করছে এ সংবাদ তো কারো জানার কথা নয়।"[১৮]

পাণ্ডবরা জতুগৃহে ছ'মাস কাটিয়েছিল, বনে বনে ঘুরেছিল আরো কয়েক মাস। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডপুত্রদের সিংহাসন এবং রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্যকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দ্রোণাচার্য ও পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মধ্যে শত্রুতা ছিল - এই কথা যেমন ধৃতরাষ্ট্র জানতেন, তেমনি বাসদেবও জানতেন। তাই ব্যাসদেব নিজের রাজনৈতিক কৌশলকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। রাজনীতিতে যেমন শত্রুও তৈরি হয়, তেমন প্রয়োজনে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হয় - একথা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। এরপর পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের জন্য দ্রুপদকে দিয়ে রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের শুরু করেন। এরজন্য তিনি দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণাকে কাজে লাগিয়েছেন। কৃষ্ণার ভুবনমোহিনী রূপ হয়ে উঠেছে ব্যাসদেবের রাজনৈতিক মূলধন। দ্রোপদীর স্বয়ংবর সভা একটি রাজনৈতিক মঞ্চের রূপ পেয়েছিল। তিন বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রনেতা জরাসন্ধ, কৃষ্ণ এবং দেবলোকের ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা, ব্রাহ্মণ, মুনি, ঋষিরা, ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের রাজারা পাঞ্চাল রাজ্যে এসেছিলেন। সেখানে ভারতবর্ষের দলগত রাজনীতির চেহারার ছবি পাওয়া যায়। এই স্বয়ংম্বর সভা দেখে ব্যাসদেব মনে মনে পর্যালোচনা করেছিলেন –

> "অম্বিকা ভীষ্মের আর্যবিদ্বেষের বহ্নিতে সারা ভারতবর্ষের আর্যসন্তানদের আহুতি দেওয়ার মহান সংকল্পের ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি যেন এই স্বয়ম্বর সভায় রূপ পাচ্ছে।"[১৯]

বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের বাইরে নতুন রাজ্য স্থাপন করার জন্য দিয়েছিল যমুনা তীরে এক বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল (খান্ডববন)। যা পরবর্তীকালে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে পরিচিত। ব্যাসদেব পাণ্ডবদের রাজপথে অধিষ্ঠিত করে ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ অম্বিকার পুত্রের ওপর অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ও রাজনীতিতে নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত মনোভাব দেখে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই দেশ ও কুলের মান-গৌরব রক্ষার্থে, গণতন্ত্রের আদর্শকে বিখ্যাত করে তোলার উদ্দেশ্যে অর্জুনকে ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে পাঠান। এখানে ব্যাসদেব ভালো রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেন। প্রয়োজনে রাজনীতিতে উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয়, তিনিও তাই করলেন। অর্জুনকে ছল করে দূরে পাঠিয়ে দিলেন। অর্জুন আর্যাবর্তের বাইরে গিয়ে অনার্যদের মধ্যে পান্ডব রাজনীতিকে ব্যবহার করলেন। তাঁর গৌরব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনার্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রীতি ও স্থাপন করলেন। যাদবের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রীর সম্পর্ক মজবুত করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের বোন সুভদ্রার সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

জরাসন্ধের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের বিনয় ,শ্রদ্ধা এবং চতুরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ব্যাসদেব। যুধিষ্ঠির সেই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অর্ঘ্য দিতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণকে। কিন্ত সকলের সামনে সেকথা বলা অনুচিত ভেবে ভীষ্মের পরামর্শ নিয়েছিলেন। ব্যাসদেব চেয়েছিলেন আসন্ন কুরু-পান্ডবদের যুদ্ধে ভীষ্মকে জড়িয়ে রাখতে। মহাভারতে ভীষ্মের বয়ানকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন প্রায় সকলেই। যেমন ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, শকুনি, বিদুর, দ্রোণাচার্য, পাণ্ডুপুত্ররা এমনকি কৃষ্ণও। কারণ তিনি মহাপ্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং সত্যব্রত। যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন পিতামহ ভীষ্মের কৃষ্ণের প্রতি এক অনুরাগ ছিল। সুতরাং কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাবে। এখানে প্রকাশিত যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক দুরাভিসন্ধি। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন –

> "সত্যিকারে কৃষ্ণই বিভেদ বিদ্বেষের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে এক মুক্ত মহান ভারতবর্ষ গঠন করতে এগিয়ে এসেছে। মানুষে মানুষে ও রাজ্যে রাজ্যে প্রীতি, মৈত্রী, সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা এবং সহাবস্থানের উপর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্বন্ধ স্থাপনের যে উদ্যোগ কৃষ্ণ একা একা করে চলেছে তাকে মনেপ্রাণে স্বাগত জানানোর জন্যে উন্মুখ হয়েছিল ভীষ্মের প্রাণ মন।"[২০]

ভীষ্মও চেয়েছিলেন এই বিদ্বেষের এবার সমাপ্তি হোক। কূট রাজনীতির খেলায় জড়িয়ে তিনি ক্লান্তি অনুভব করছিলেন।

মহাভারতে প্রতিহিংসা কারণেই দুর্যোধন ও পাণ্ডবদের মধ্যে একাধিকবার দ্বন্দ্ব হয়। শকুনি যেমন তাঁর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভাই-ভাই এ বিরোধের সৃষ্টি করে। ঠিক তেমন ব্যাসদেব নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এত রাজনৈতিক পরিকল্পনা করেন। তাই দুর্যোধনের মৃত্যুতে তাঁর ভেতর কোনরকম অনুশোচনা দেখা যায়নি –

> "এই লোকক্ষয়ী যুদ্ধের স্রষ্টা সে নিজে। অম্বালিকার ঘৃণা, প্রত্যাখ্যান, অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল দ্বৈপায়ন। দুর্যোধনের মৃত্যুতে সেই প্রতিজ্ঞাপূরণ হল। পাণ্ডবেরা শত্রুহীন হল। আর্যাবর্ত বীরশূণ্য হল। রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা শেষ হল।"[২১]

মহাভারতে উল্লেখ্য সিংহাসনকে কেন্দ্র করে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হয়, তাতে ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা প্রকাশিত। শকুনি ও কৃষ্ণ উভয়ই রাজনীতিতে কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন' উপন্যাসে মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে দ্বৈপায়নের প্রতি অবহেলা, অসম্মান। যা তার মনে বিদ্বেষ ও হিংসার বীজ হিসাবে রোপিত হয়। তিনপুরুষ ধরে চলে আসা আর্যরা অনার্যদের প্রতি যে অশ্রদ্ধা, অপমান ও অবহেলা করে এসেছিল, তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকেও বেছে নিতে হয়েছিল কূট রাজনীতির পথকে। যা শেষপর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। এছাড়াও দ্বৈপায়ন ও ভীষ্মের মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম, জটিল রাজনীতির খেলা চলছিল। মহাভারতে সেই প্রতিহিংসা ও রাজনীতির প্রসঙ্গকেও ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্র এই উপন্যাসে পাঠকের সামনে নতুনরূপে উন্মোচন করেছেন। এই উপন্যাসে মহাভারতের রাজনীতির এক ভিন্ন দিকের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

## Reference:

১. ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪, পৃ. ২২৭
২. বসু, প্রতিভা, মহাভারতের মহারণ্যে, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৪৮, পৃ. ১৫
৩. বসু, রাজশেখর, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত সারানুবাদ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৯
৪. চন্দ্র, দীপক, কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২৩, পৃ. ৫
৫. তদেব, পৃ. ৫
৬. তদেব, পৃ. ৭
৭. তদেব, পৃ. ৯
৮. তদেব, পৃ. ৪০
৯. তদেব, পৃ. ৪৪
১০. তদেব, পৃ. ৬৪
১১. তদেব, পৃ. ৬৪
১২. তদেব, পৃ. ৮২
১৩. তদেব, পৃ. ৯০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 39
Website: https://tirj.org.in, Page No. 365 - 373
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. তদেব, পৃ. ৯৩
১৫. তদেব, পৃ. ১০৯
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৭
১৭. ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারতের ছয় প্রবীণ, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৩১
১৮. চন্দ্র, দীপক, 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১৪৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৯
২০. তদেব, পৃ. ১৭৬
২১. তদেব, পৃ. ১৯২

## Bibliography:

**আকর গ্রন্থ :**
চন্দ্র, দীপক, 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৩

**সহায়ক গ্রন্থ :**
দাস, কাশীরাম, কাশীদাসী মহাভারত (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৮
দাস, কাশীরাম, কাশীদাসী মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২
বসু, প্রতিভা, মহাভারতের মহারণ্যে, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৪৮
বসু, রাজশেখর, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত সারানুবাদ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২৭
ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি, পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪
ভাদুড়ী, নৃসিংহ প্রসাদ, মহাভারতের ছয় প্রবীণ, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৩